ই লি রি য়া না

কাজী জহিরুল ইসলাম

কিস্তি-৩

চলে যাবার সময় তাড়াহুড়ো করে নামমাত্র মূল্যে সার্বিয়ানরা তাদের বাড়িগুলোর দখল দিয়ে যাচ্ছে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র সার্বিয়ানদের হাতে, যাদের বেলগ্রেডের মতো বড় শহরে গিয়ে বসবাস করার সামর্থ নেই, অথবা সুসম্পর্ক আছে এমন আলবেনিয়ানদের কাছে। আর রাতের অন্ধকারে আকাশ ফাটিয়ে, মাটি কাঁপিয়ে সেই বাড়িগুলোই ভেঙে পড়ছে, যেগুলোর দখল পেয়েছে আলবেনিয়ানরা। এর মানেটা কি দাঁড়ালো? তার অর্থ কি এই নয়, আলবেনিয়ানরা যাতে এই বাড়িগুলোর দখল না পায় সেজন্য সার্বিয়ানরাই রাতের অন্ধকারে বোমা মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে, পুড়িয়ে দিচ্ছে, গুড়িয়ে দিচ্ছে?

কালো আর্মিটি উসখুস করছে। ওর পিচের মতো ঢেউ খেলানো মোটা লাল ঠোঁট ফুলে উঠছে, দাঁত দিয়ে তা কামড়াচ্ছে সে। আর বার বার তাকাচ্ছে ইলির শরীরের দিকে। ওর শরীর থেকে বেরিয়ে পড়া স্তনযুগলের দিকে। পিছমোড়া করে হাতকড়া পরাবার কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বড় লাগছে ওর স্তন দুটি। ঘুমানোর পোশাকেই ওকে তুলে আনা হয়েছে। ফলে সংক্ষিপ্ত নিটের পাতলা আবরণ ছিঁড়ে যেন ওগুলো বেরিয়ে আসতে চাইছে। উরুর ওপর ভাঁজ করে রাখা বলিষ্ঠ হাতটি নড়ে ওঠে কালো সৈনিকটির।

বুকে হাত দেবে নাকি? ইলির মাথায় বিদ্যুৎ গতিতে প্রশ্নটি উঁকি মারার সাথে সাথে ধমকে ওঠে ভালবোনা, 'জেমস'। সঙ্গে সঙ্গে ওর মজবুত কালো গ্রানাইট পাঞ্জাটি থপ করে চেপে বসলো ইলিরিয়ানার কাঁধের ওপর। ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে ইলি। সামনের আসন থেকে শাদা চামড়ার মার্কিন সৈনিক কঠিন চোখে তাকায় কালোটির দিকে। আর কালোটি, যার নাম জেমস, সে শব্দ করে হেসে উঠে ইলিরিয়ানাকে বলে, 'হাই মাই ডিয়ার'।

মার্কিন সৈনিকের এই অস্বাভাবিক, অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারে মোটেও অবাক হয় না ইলি। পাগলের জাতি বলে মার্কিনীরা বিশ্বখ্যাত। কসোভোতেও এর অনেক প্রমাণ ওরা দিয়েছে। একটি চৌদ্দ বছরের আলবেনিয়ান কিশোরীকে ধর্ষণ করে মেরে ফেলেছে এক মার্কিন কালো সৈনিক। এরকম বর্বরোচিত ঘটনা কেবল আমেরিকানরাই ঘটিয়েছে কসোভোতে, ন্যাটোর আর কোন সদস্য দেশের সৈনিকরা এসব করেনি। মার্কিন সরকার এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে, তৎক্ষনাত সেই অপরাধীকে ক্লোজ করে দেশে ফেরত নিয়ে গেছে। হয়ত এরপরে ওর ক্যাপিটাল পানিশমেন্টও হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাতে ওই মেয়েটির পরিবারের যে ক্ষতি হয়েছে, যে গভীর ক্ষত হয়েছে ওর পরিবারের বুকে, তা থেকেতো আর ওরা পরিত্রাণ পায় নি। হয়ত আরো অনেকদিন এ ক্ষত বয়ে বেড়াতে হবে এই হতভাগা পরিবারটিকে এই রক্ষণশীল আলবেনিয়ান সমাজে।

মাত্র সাতদিন আগে পোজরানের এক আট বছরের শিশুকে গুলি করে মেরে ফেলেছে আরেক মার্কিন সৈনিক। হত্যা করার পরে হত্যাকারীর সে-কি নাটক, সে নাটক পুঙ্খানুপুঙ্খ ছাপা হয়েছে 'কোহা দিতোরে' পত্রিকায়। নাটক কি আলবেনিয়ানরাও কম করেছে? সেই ছেলের জানাজায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে হত্যাকারীকে। সে তার সহকর্মীদের নিয়ে তাতে অংশগ্রহনও করেছে, সমব্যদনা জানিয়েছে শোকগ্রস্ত পরিবারকে।

এ জাতীয় ঘটনা কেবল মার্কিন সেনাবাহিনীর দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই বহিঃপ্রকাশ। জিল্যান রিজিয়নের সর্বত্রই একটি দৃশ্য দেখা যায়, চেকপোস্টে কর্তব্যরত কেফোরের সৈনিকদের ঘিরে রেখেছে কতগুলো শিশু। প্রথমে স্ট্রেঞ্জার ভেবে ভয়ে ভয়ে কাছে আসলেও এখন মার্কিন সেনাদের সাথে কসোভোর শিশুদের, কি সার্বিয়ান, কি আলবেনিয়ান, কি রোমা, কি ক্রোট, কি তুর্কিশ, কি বশনিয়াক, সকলেরই বেশ ভাব, বেশ বন্ধুত্ব। আর বন্ধুত্বেরই বলি সেই ধর্ষিতা কিশোরী এবং নিহত শিশু। শিশুদের সহজাত কৌতুহল, আজানাকে জানার আগ্রহ জাত-ধর্ম, ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই সমান। আজানকে

জানার জন্য, অচেনাকে চেনার জন্যই ওরা কাছে আসে এই ভিনদেশী মানুষদের, গড়ে তোলে নিবিড় সখ্য। আর বোনাস হিসাবে পায় একটি চকোলেট, একটি ডয়েশ মার্ক এবং কিছু ইংরেজী শব্দ শেখার সুযোগ।

বন্ডস্টিলে ঢোকার প্রবেশমুখে তিন স্তর বিশিষ্ট দূর্গম চেকপোস্টের অন্তত পঁচিশ মিটার দূরে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে নয়টি এপিসি। আকাশে বেশ কটি শকুণ উড়ছে। নীল আকাশ। মেঘের কোন ছিটেফোটাও নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুকটা কেঁপে ওঠে ইলির। আকাশে শকুণ উড়ছে কেন? এর মানেটা কি? তৎপর সৈন্যরা প্রতিটি এপিসিকে আদ্যোপান্ত স্ক্যান করছে, স্ক্যান করছে ওগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো সুসজ্জিত সৈনিকদেরও। এটা নিত্যদিনের দৃশ্য ভালবোনার, ইলিরিয়ানার কাছে নতুন। বন্ডস্টিল সম্পর্কে শুধু শুনেছে ইলি কখনো দেখার সৌভাগ্য হয়নি। উচেকার গেরিলাদের মধ্যে বন্ডস্টিল নিয়ে বেশ কৌতুহল। বন্ডস্টিল দেখার শখ প্রায় সকলেরই। ধীরে ধীরে ওদেরকে বহনকারী জিপটির পালা আসে। সবাই গাড়ি থেকে নেমে উপরে হাত তুলে দাঁড়ায়, শুধু ইলি ছাড়া। পিছমোড়া করে হাতকড়া পরাবার কারণে ওকে হাত তুলতে হলো না। ওর সমস্ত শরীর স্ক্যান করা হলো, একবার, দুইবার, তিনবার। পরপর তিনটি চেকপোস্ট পেরিয়ে বন্দী ইলিরিয়ানা ঢুকে পড়লো বন্ডস্টিলে।

ডানদিকের হেলিপ্যাডে ছয়টি এপাচি ছাড়াও এগারটি সামরিক হেলিকপ্টার শরীরে মার্কিন আর্মির ক্যামোফ্লেজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল পাহাড়ের খানাখন্দ, চড়াই-উৎরাই জুড়ে তৈরী করা হয়েছে বন্ডস্টিল বেইজ। চারপাশে তেমন কোন সবুজের ছিটেফোটা নেই। মনে হচ্ছে একটি মরুপাহাড়। তার বুক চিয়ে এঁকে-বেঁকে ছুটে যাওয়া প্রশস্ত এসফল্টের রাস্তা। রাস্তার পাশে বেশ বড় বড় গতি নির্দেশক ফলক রয়েছে। কোথাও ১৬ কিলোমিটার বা ১০ মাইলের ওপরে গাড়ি চালাবার অনুমতি নেই। প্রতিটি রাস্তার প্রতি ইঞ্চি জায়গা গতি নিয়ন্ত্রক স্বয়ংক্রিয় রাডারের নিয়ন্ত্রণে এবং সিসিটিভি ক্যামেরার ল্যান্সের আয়ত্বে। যেন শত সহস্র ডিজিটাল চোখ তাকিয়ে আছে এইসব রাস্তায় চলাচলকারীদের গতিবিধির ওপর।

বন্ডস্টিলে ঢোকার পর থেকেই বুক ধরফর করছে ইলিরিয়ানার। ভয়ে না, উত্তেজনায়। ইলি ভয় পাচ্ছে না তেমন। কারণ ও জানে আমেরিকার সাথে তমকার যে সম্পর্ক তাতে ওকে আটকে রাখার কোন কারণ নেই। তবে কিছুটা টর্চার করবে কি-না এটা ভেবে ও কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়ছে। চারদিকে ভারী অস্ত্রশস্ত্র আর সমরযানের সরব উপস্থিতি। কসোভোর রাস্তায় দেখেছে ইলি, কেফোরের এপিসিগুলো কোনরকম ট্রাফিক আইন মানে না। যখন-তখন যেখানে-সেখানে পার্ক করা, ঘোরানো, পথের মাঝখানে থামিয়ে ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি করা ওদের নিত্ত-নৈমিত্তিক ব্যাপার। অথচ সেই বেপরোয়া এপিসিগুলোও বন্ডস্টিলের ভেতরে কেমন রাগী শিক্ষকের সামনে ভীত, অনিচ্ছাকৃত ভদ্র, ছাত্রের মতো গতি নির্দেশক ফলকগুলোকে সমীহ করে লাইন করে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে।

ইলির মস্তিস্কের জানালায় প্রশ্নটা আবারো উঁকি দেয়, ওকে কি টর্চার করবে? আবার নিজেই জবাব দেয়, না টর্চার করবে না। আমেরিকার সাথে আমাদের যে পলিটিক্যাল সম্পর্ক তাতে উচেকার একজন সাবেক গেরিলাকে টর্চার করার কথা না। কিন্তু যুক্তিটা ওকে স্বস্তি দেয় না মোটেও। যদি ব্লুকটের ঘটনার জন্যই ওকে ধরে আনা হয়, সেজন্যতো আর ও দায়ী না? এবার একটি মুচকি হাসির আভাস এক ঝলকের জন্য ওর ঠোঁটে ফুটে উঠেই আবার তা নিভে যায়। ওদের ইন্টেলিজেন্স কতোটা ধারালো? ভাবতে ভাবতে জিপ থামে কোন এক গন্তব্যে, নির্দেশ আসে নেমে আসার। ইলি নেমে আসে জলপাই রঙের জিপের বাইরে। আকাশে তখন এপ্রিলের সূর্য, সকালের প্রভা ছড়াচ্ছে, তবুও হালকা শীতের ঝাপ্টা লাগে ইলির চোখে-মুখে।

দুই

এখনো সময় আছে এমিনে, আরো ভালো করে ভেবে দেখো।
যা ভাবার চারমাস আগেই ভেবেছি, আজ আর নতুন করে কিছু ভাবার নেই।
গোয়ার্তুমি করোনা। লোকে যখন জিজ্ঞেস করবে, একটা পরিচয়তো দিতে হবে।
আফ্রিমের এ কথায় এমিনের গায়ে ফোশকা পড়ে। চারমাস ধরে এতোবার বলার পরেও একই প্রশ্ন সে বারবার করছে।
রাহোভেচের মানুষ যদি টের পায় আমাকে সপরিবারে গ্রাম ছাড়া করবে। ঠ্যাঙাবে আমাকে।
কথাটা স্বগতোক্তির মতো করলেও এমিনে তা শোনে এবং জবাব দেয় অফ্রিমকে।

তার বিকল্পও আমি তোমাকে বলেছি। আমরা আবার সুহারেকায় ফিরে যাবো। এখানকার সব বেঁচে দিয়ে নেদিরের বাড়ির পাশে দালান তুলবো। যুদ্ধের পরেতো অনেকেই জায়গা বদল করছে। রাহোভেচের চেয়ে সুহারেকা খারাপ কি? ওখানেতো হেসাতও আছে, তোমার নিজের ভাই।
আর কোন কথা বাড়ায় না আফ্রিম। এই জাকোভার মেয়ে এমিনের সাথে তর্কে কোনদিনও জেতেনি ও। বারোটা বছরতো একসঙ্গে কাটলো। বারো বছর, অনেক লম্বা সময়।
একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মার্সিডিসটাকে ডানদিকের গলিতে ঢোকায় আফ্রিম। আর ঠিক তখনি, ঘোরাবার মুখে, বনেটের ওপর মার্সিডিজের আভিজাত্যের তিলক, ওর কপালের তিন ঠ্যাংঅলা রূপালী মনোগ্রামে সূর্যের আলো পড়ে তা প্রতিফলিত হয়। তারই ফ্ল্যাশ গিয়ে পড়ে পাশের কফিশপে আড্ডারত তিন যুবকের একজনের চোখে। বিরক্ত হয় সে। বুদোলা (পাগল) বলে গাল দিয়েই হঠাৎ বেবীকেসটি দেখতে পায় গাড়ির ভেতরে, এমিনের কোলের ওপর।

চারমাসে অনেক বদলে গেছে রাহোভেচ। ভাবতে ভাবতে গিয়ার বদলায় আফ্রিম। ফার্স্ট গিয়ারে এক্সেলারেটর দাবায়, ঘোৎ ঘোৎ করতে করতে বুনো জন্তুর মতো মার্সিডিজটি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এঙ্গেলে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। ঘোড়ার আস্তাবলের দরোজার মতো বেশ উঁচু একটি কালো কাঠের নেবানো গেইটের সামনে এসে গাড়ি থামায় আফ্রিম। হ্যান্ডব্রেক টেনে দিয়ে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে, বেশ বড়। ভূতল থেকে আকাশ অব্দি যেন দাঁড়িয়ে আছে কালচে দাগ পড়া এক কাঠের সিংহতোরণ। আফ্রিম গাড়ির হর্ণ বাজায় না। গাড়ি থেকে নামেও না। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকে ভেজানো তোরণটির দিকে। আকাশে তখন মেঘ করে। মেঘের ছায়া এসে পড়ে ওদের গাড়ির ওপরে, কাঠের তোরণের ওপরে, দেয়ালের ভেতরের আঙুরের ঝোপে।
কি দেখছো? মনে হয় এ বাড়িতে নতুন এলে? নেমে পড়ো, এটা তোমারই বাড়ি। দুঃখিত, তোমার বাবার বাড়ি।
এমিনে দেখো, ওই পুরোনো দরোজাটির দিকে তাকিয়ে বুকটা ভরে যাচ্ছে না? নিজের বাড়িতে বহুদিন পর ফিরে আসার আনন্দই কি শুধু? ওই কাঠের দরোজার হাতলে আমার শৈশবের নরোম হাতের ছোঁয়া, কৈশোরের দুরন্ত হাতের ছোঁয়া। এই কাঠের দরোজার বুড়ো বুকটাতে মিশে আছে ইলের সম্প্রদায়ের হাজার বছরের ঐতিহ্য।
বাঁ দিকটাতো ঝাঝরা হয়ে গেছে।
হ্যাঁ, ইলেরদের বুক ফুটো করে দিয়েছে সার্বিয়ানরা।
কথাটা বলার সাথে সাথে এমিনে তাকায় বেবিকেসটির ভেতরে গুটিশুটি মেরে ঘুমিয়ে থাকা এত্তুটুকুন একটি শিশুর দিকে। শিশুর মুখটি খুঁজে পায় না ও। তাকিয়ে থাকে ওর শরীর জড়ানো তুর্কি তোয়ালেটির দিকে। ভাবতে চেষ্টা করে এমিনে। কেমন হয়েছে এ শিশু দেখতে? আফ্রিমের কথাই কি একদিন ঠিক হবে? রক্তই কি সব? যদি তা-ই হয়, তাহলেতো ওর গায়ে মায়ের রক্তও আছে। ওর গায়েতো শুধু সার্বিয়ান মিলিটেরির রক্তই না, আছে এক বীরাঙ্গনা আলবেনিয়ান নারীর রক্তও। দেখা যাক কোন রক্তের ধারা কতটা তীব্র। ভাবতে ভাবতে বেবিকেসটিকে বেশ শক্ত করে চেপে ধরে এমিনে।

আফ্রিম ভাবছে অন্য কথা। দরোজাটি মেরামত করা দরকার।

পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এঙ্গেলে কাঠের দরোজায় নাক ঠেকিয়ে থেমে আছে মার্সিডিজ। বেশ ক বার জোরে জোরে হর্ণ বাজায় আফ্রিম। মনে পড়ে ওদের বিয়ের দিনের কথা। বরযাত্রার গাড়িগুলো এমনি হর্ণ বাজাতে বাজাতে উল্লাস প্রকাশ করতে করতেই ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলো। এমিনেও কি একই কথা ভাবছিলো? ওর চোখের দিকে তাকাতেই কেমন একটা লজ্জার হাসি ওর ঠোঁটের কোনে ফুটে উঠলো।

গেইট খুলে একটি দিগন্ত বিস্তৃত হাসি উপহার দেয় দ্রিতন।

কোন কিছু লুকায়নি এমিনে। সব শুনে ইদ্রিস এবং দেয়া, আফ্রিমের বাবা-মা বোবা হয়ে গেছেন। আসলে ঘটনাটিকে লুকোবার কোন উপায় নেই, আর সেরকম ইচ্ছেও নেই এমিনের। এমিনে সব বলে ফেলেছে, যখন সদ্য উচেকা থেকে ফেরা ওর দেবর দ্রিতন পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। রক্ত গরম দ্রিতনের, সতের বছরের শরীরে ক্রোধের গনগনে আগুন। সেই গরম রক্ত সার্ব রক্তের ঘ্রাণ সহ্য করতে পারে না। ছুটে যায় নিজের ঘরে। দু মিনিটের মাথায়ই ফিরে আসে ওর একে-৪৭টি নিয়ে।
শিশুটিকে আমার হাতে তুলে দাও।
কথাটা বলেই ঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা বেবিকেসটির দিকে পা বাড়ায় দ্রিতন।
দ্রিতনের এ কথায় এমিনেকে যুগপৎ অবাক করে দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায় আফ্রিম।

না। মেরে ফেলার জন্য গত চার মাস ধরে এ শিশুকে আমরা পালছি না।
সরে যাও আফ্রিম। একজন উচেকার বাড়িতে সার্বের রক্ত? কিছুতেই হতে পারে না। এ শিশুকে মরতেই হবে।
এবার মুখ খোলে এমিনে।
দ্রিতন। শোননি যে বললাম, এ শিশুটিও একজন উচেকার সন্তান।
দ্রিতন আর কোন কথা বাড়ায় না, কথা বলে না আফ্রিম কিংবা এমিনেও। এই পরিস্থিতির একটি ইতিবাচক সমাধান ওরা সবাই আশা করছে ওদের পিতা ইদ্রিসের কাছ থেকে। দেয়ার এ বিষয়ে তেমন কোন ভূমিকা নেই। আলবেনিয়ান সমাজে স্ত্রীলোকদের সিদ্ধান্ত গ্রহনে কোন ভূমিকা রাখার প্রথা নেই। ওদের দায়িত্ব স্বামী এবং তার পরিবারকে খুশি রাখা। এমিনে এর ব্যতিক্রম, বুঝি ওর ভালোবাসা আফ্রিমের প্রতি এতোটাই তীব্র যে সকল প্রথাকেই তা ছাপিয়ে যায়। বৌমার কাজ-কর্মে দেয়া যে খুব অসন্তুষ্ট এটা তার কপালের রিঙ্কেলসগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এমিনে ভয় পাচ্ছে, শ্বাশুড়ি না ওর বারো বছরের অক্ষমতার ইতিহাস তুলে ধরেন। তরুণী বয়স থেকেই আলবেনিয়ান মেয়েরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনর্গল কথা বলে, কথা বলে ছেলেরাও। তবে এই সম্প্রদায়ের মেয়েদের কথা বলা এবং সিগারেট খাওয়ার ক্ষমতা পুরো ইওরোপে বিখ্যাত। বিয়ের পর কিছুদিন দাম্পত্য সুখে নিমজ্জিত থাকার কারণে বাচালতার প্রগলভতা দেখা না গেলেও বয়স চল্লিশ পেরুলেই তা বাড়তে থাকে জ্যামিতিক হারে।

এমিনের কপাল ভালো যে ওর শ্বাশুড়ি এখনো সেই ভাঙা রেকর্ড বাজাতে শুরু করেন নি। অনেকক্ষণ পর কথা বলেন ইদ্রিস। হয়ত মানবতার অমিয় ধারায় প্লাবিত হয়ে থাকবে ওর হৃদয়। তিনি সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন, কসোভা স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত এ শিশু এ বাড়িতেই থাকবে এবং সুলেইমানি পরিবারের নামই বহন করবে। আজ থেকে ওর নাম পাভারেসি, পাভারেসি সুলেইমানি।

পাভারেসি? সঙ্গে সঙ্গে সকলেই আঁতকে ওঠে। দ্রিতনও কি এর মধ্যে অন্য কোন দর্শন খুঁজে পায়? পাভারেসি আলবেনিয়ান শব্দ। এর অর্থ স্বাধীনতা। দ্রিতনের হাত থেকে কি বন্দুক খসে পড়ছে? ও এমন স্থির, ভাস্কর্য হয়ে গেল কেনো?

ইদ্রিস সুলেইমানি আঁড়াআঁড়ি উঠোন অতিক্রম করে এগিয়ে আসে দ্রিতনের কাছে। ওর কাঁধে হাত রেখে বলেন, বন্দুক নয়, বুদ্ধি দিয়ে অর্জন করতে হবে স্বাধীনতা। ওদের মাথার ওপর তখন আঙুরের মাচায় শুয়ে থাকা মরা-কালো ডালগুলোতে কচি কচি অসংখ্য কুঁড়ির উঁকি মেলে দিয়েছে সবুজ পাতা। আর এর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশ। সেখানে মেঘের ছিটে-ফোটাও নেই।

আড্ডা জমে উঠেছে তিন যুবকের। ততোক্ষণে আরো দুজন এসে যোগ দেয় মুখরোচক আড্ডার টেবিলে। উচেকা থেকে ন্যাটো, ন্যাটো থেকে কেফোর, কেফোর থেকে উনমিক, উনমিক থেকে ওএসসিই, এভাবে আড্ডার ঢেউ বাঁক খেতে খেতে গিয়ে থামে আফ্রিমের স্ত্রী এমিনের কোলের ওপর। কি ছিল ওটা? সন্তান? বারো বছর পর হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই বাবা হয়ে গেল আফ্রিম? কেমন একটা সন্দেহের ধোয়া ওদের পাঁচজনের মাঝখানে কালো মার্বেলের টেবিলের ওপর রাখা সোনালী এশট্রে থেকে ধীরে ধীরে ক্যাফেটেরিয়ার ছাদের দিকে উঠে যাচ্ছে। এই ধোয়া কি ক্যাফেটেরিয়ার বাইরেও যাবে?

ব্যাবসার খবর বল।
যে যুবকটির নাম আলী, কানের নিচে আই লাইনারের সরু দাগের মতো জুলফি নেমে এসেছে চিবুক অব্দি, সে বললো। ওর হাতের সিগারেট তখন নামিয়ে রেখেছে সোনালী এশট্রেতে, ধোয়া উঠছে তা থেকে।
তুর্কিশ কফির কাপ ওর ঠোঁটে, যখন এ প্রশ্নের জবাবে মুখ খুলছিলো অন্য এক যুবক, শেফশেত।
উনমিক ট্যাক্স বসাবে। ভালোই এতোদিন ব্যাবসা করছিলাম। ট্যাক্স বসালেতো লাভ কমে যাবে।
ট্যাক্স বসিয়ে কি উনমিক স্মাগলিং বন্ধ করতে চায়?
তৃতীয় যুবক ক্রেশনিকের প্রশ্ন।
বিজ্ঞের মতো এদিক-সেদিক মাথা নাড়ে আগিম, তারপর ওর ডান হাতের তর্জনী তুলে ডানে-বাঁয়ে কয়েকবার বাতাস কেটে মাথা নাড়ানোটাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করায়।
না, স্মাগলিং নিয়ে উনমিকের কোন মাথাব্যাথা নেই। ট্যাক্স বসাচ্ছে ওদের আয় বাড়ানোর জন্য।
তখন বোকার মতো মন্তব্য করে আলী।
উনমিকের কি টাকার অভাব? কত শত শত গাড়ি, বিপিকের (ব্যাংকিং এন্ড পেমেন্ট অথরিটি অব কসোভো) ভল্ট ভর্তি ডয়েশ মার্ক।

অন্য এক টেবিল থেকে মন্তব্য করে একজন।
সে টাকাতো উনমিকের ইন্টারন্যাশনালরাই সব খেয়ে ফেলে। দেশ চালাতে টাকা লাগবে না? কসোভো চালাতে যে টাকা লাগে সেই টাকা ওরা কসোভো থেকেই তুলে নেবে।
যে কোন কারণেই হোক আন্তর্জাতিকদের প্রতি বিষোধগার উচ্চারিত হয় আজ এই কফিশপে। ভিন্ন টেবিলের এই মন্তব্যের সূত্র ধরে পাঁচ যুবক দীর্ঘ সময় ধরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কসোভোতে অবস্থান বিষয়ক নানামূখী আলোচনায় লিপ্ত হয়।
ষষ্ঠ যুবকটি তখন হন্তদন্ত হয়ে ঢোকে কফিশপে। অন্য টেবিলের নিচ থেকে একটি প্লাস্টিকের চেয়ার টেনে যোগ দেয় এই অলস আড্ডায়।
গরম খবর আছে।
সবাই চোখ বড় বড় করে তাকায় ওর দিকে। ছয়টি মাথা একে অন্যের খুব খুব কাছাকাছি চলে আসে। তারপর ফিসফিস করে খবরটি দেয় ষষ্ঠ যুবক।

বাচ্চার জন্য টুকিটাকি জিনিস কিনতে হবে, নিজেদেরও কিছু গ্রোসারি দ্রব্যাদির প্রয়োজন। গলির মোড়ের কিয়স্কের সামনে এসে দাঁড়ায় আফ্রিম। দু ডয়েশমার্কের একটি কয়েন বাড়িয়ে দিতেই দোকানী মেয়েটি ওর দিকে এক গাল হাসি আর সাথে এক প্যাকেট লাকি স্ট্রাইক সিগারেট বাড়িয়ে দেয়। সেই সঙ্গে আফ্রিমের দিকে তাকিয়ে এক চোখ টিপে দিয়ে মেয়েটি বলে, উরিমে (কংগ্রাচুলেশন্স) আফ্রিম।

আফ্রিম ফালমিন্দারিত (ধন্যবাদ) বলেই দ্রুত পা বাড়ায় ছোট্ট এ শহরটির কেন্দ্রের দিকে। ওর বুকের ভেতরটা খচ করে ওঠে। মেয়েটি চোখ টিপলো কেন? তবে কি ও জেনে গেছে আমি এ সন্তানের পিতা না। আমিই বা ওর দিকে তাকিয়ে না হেসে, ভালো-মন্দ না জিজ্ঞেস করে চলে এলাম কেন? আমি নিজেই কি অস্বাভাবিক আচরণ করছি না? নিজেই কি আমি ধরা পড়ার ফাদ তৈরী করছি? না, আমাকে বিচলিত হলে চলবে না। আমাকে অবশ্যই স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে। আলবেনিয়ান সমাজে নিশ্চয়ই এমন একটি দৃষ্টান্তও নেই যে চারমাস পরে দেখা হওয়া কোন পরিচিতজনকে কুশল জিজ্ঞেস করা হচ্ছে না, শত্রু হলেও। আমাদের ঐতিহ্যের এটিই সবচেয়ে বড় দিক যে আমরা ইউরোপের সবচেয়ে অতিথিপরায়ন জাতি। কুশল বিনিময়ে আমরা ইউরোপের অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক বেশি আন্তরিক। আমি আজ স্বজাতির ঐতিহ্যে ছেদ ফেললাম। এখন থেকে আমাকে সাবধান হতে হবে।

ভাবতে ভাবতে আফ্রিম হাঁটতে থাকে সেন্ট্রাল স্কোয়ারের দিকে। ছোট্ট এক চিলতে শহর রাহোভেচ। পাহাড়ের ভেলিতে হাতে গোনা কিছু বাড়ি, দুটি মসজিদ, যার একটি যুদ্ধের সময় সার্বিয়ানদের বোমার আঘাতে গুড়িয়ে গেছে। একটি স্কুল, একটি এম্বুলেন্টা (হাসপাতাল) আর সাপের মতো আঁকাবাঁকা কিছু এসফল্টের আর কিছু কংক্রিটের রাস্তা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই ছোট্ট শহরটি। একটু দূরে গেলেই এই শহরবাসীদের আবাদী জমি। ওখানে গম, ভূট্টার হৃদয় দোলানো ঢেউ, আঙুর মাচার সুবিশাল ছাদ আর পাহাড়ের ঢাল জুড়ে ওয়ালনাট ও এলমন্ড গাছ।

পেছন থেকে ওর ঘাড়ের ওপর এক মণি গদা বসিয়ে দেয় কেউ। বোঁ করে মাথা ঘুরে ওঠে আফ্রিমের, চোখে শর্ষেফুল দেখতে থাকে। টলতে টলতে নিজেকে সামলে নিয়ে পেছনে তাকাতেই দেখে দাঁত বের করে হাসছে ক্রেশনিক। এ জাতীয় গাধামী টাইপের মশকরা করাই আলবেনিয়ানদের অভ্যাস। যে অভ্যাসটা ভীষণ অপছন্দ আফ্রিমের। টলতে টলতে সোজা হয়ে দাঁড়ায় আফ্রিম। ঝাপসা দৃষ্টি স্বাভাবিক হতেই স্পস্ট হয়ে ওঠে ক্রেশনিকের গোলগাল মুখটি।